আগমনী

শ্রীশ্রীদুর্গা : তত্ত্ব ও স্বরূপ

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর

দুর্গতিনাশিনীর আবাহনে:

“এসেছে শরৎ, হিমের পরশ/ লেগেছে হাওয়ার পরে—/সকালবেলায় ঘাসের আগায়/ শিশিরের রেখা ধরে।” ছোটবেলায় পড়া ‘সহজপাঠ’-এর এই লাইনগুলি মনে পড়লেই হিমের স্পর্শ ছাড়াও আর একটি বিষয় জেগে যায় আমাদের স্মরণপথে—শারদীয়া দুর্গাপূজা। মহালয়ার ভোরে যখন ঊষার আলো-আঁধারির পর্দা ঠেলে মৃদু সুর ভাসতে থাকে ‘বাজলো তোমার আলোর বেণু’, তখন কে-ই বা ভাবে—

বেণু কীভাবে আলো দিয়ে তৈরি হবে? কীভাবেই বা আলোর বাজনা বেজে ওঠে? আলো তো দেখার ! তাহলে?

আসলে যে-আলো অন্ধকারের দুর্গম দরজা ভেঙে উদ্ভাসিত করে ব্যক্তি ও জগতের ভিতর ও বাইরেকে, সে-আলো যে চিরনতুনের জয়ধ্বনিরই বৈতালিক। সে দুঃখ-নিরাশা-দুঃস্বপ্নের সময় উত্তীর্ণ করে মানুষকে নতুন চেতনায়, সাধনায়, সংকল্পে; এগিয়ে দেয় মানুষকে অনিভন্ত জীবনের অনন্ত পথের দিকে। শারদীয়া দুর্গাপূজা গোচরে-অগোচরে আমাদের জীবনে এই আঁধিয়ার-ভাঙা অলোক-আলোকের জয়শ্রী আর জয়ধ্বনি ছড়িয়ে দেওয়ার সাম্বাৎসরিক আয়োজন-উৎসব। দুর্গাপূজা তাই কেবল মনোরম পোশাক নয়, আলো-ঝলমলে প্যান্ডেল নয়, থিমের বিজ্ঞাপনে থমকে যাওয়া হেঁটে-চলা নয়—সে আমাদের জীবনের কোনও এক অজানা দূর কাল থেকে বয়ে আসা শেষহীন প্রাণ-জাগানিয়া সাধনার মঙ্গলারতি। তার স্নিগ্ধ উত্তাপে জীবনের শাশ্বত ঠিকানা খোঁজার প্রয়াস জেগে থাকে কত ঘুমহীন দিনে-রাতে; অজস্র দুর্যোগের ধূলিধূমে সঙ্কীর্ণ বাতায়নপথে সে-প্রয়াসই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের সভ্যতাকে যুগান্তরের উপলাস্তীর্ণ এই রাজসরণিতে। দুর্গাপূজায় তাই

আর্তিহারিণীর সাধনা, সংকটনাশিনীর কাছে শরণাগত সাধকের কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা, দুঃখদলনীর চরণে দুঃখমোচনের জন্য পুষ্পাঞ্জলি-নিবেদন। আনন্দের কলাবতী রাগিণীর সুর-ধ্বনির মধ্যে তাই মিশে থাকে তাপস-প্রার্থনার অমূল্য অশ্রুকণা।

‘দুর্গা’ নাম-নিরুক্তি ও স্বরূপকথন

আসলে আমাদের শাস্ত্রকাররাও নানাভাবে দেখিয়েছেন ‘দুর্গা’ নামটাই দুঃখ-দুর্গতি-দুর্গমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অন্বিত। একটু দেখে নিই ‘দুর্গা’ নামের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার নানা অপূর্ব দৃষ্টিকোণ।

শব্দকল্পদ্রুমকার বলছেন, “দুর্দুঃখেন গম্যতে প্রাপ্যতেঽসৌ।”... “দুর্+গম্+ ‘সুদুরোরধিকরণে’ ইত্যস্য বার্তিকোক্ত্যা ডঃ। ততষ্টাপ্।”[১] অর্থাৎ, গভীর দুঃখের সাধনায় যাঁর কাছে যাওয়া যায় বা যাঁকে পাওয়া যায়। আরও বলছেন,

“দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥”

অর্থাৎ, দুর্গা শব্দের অর্থ বোঝাতে যেমন দুর্গ দৈত্যের হন্তাকে বোঝানো যেতে পারে, তেমনই মহাবিঘ্ন, সংসারের বন্ধন, কুকর্ম, মহাভয়, অতিরোগ ইত্যাদি বিষয়কেও বোঝানো যায়।[২]

শব্দকল্পদ্রুমকার দুর্গা শব্দের বর্ণ বা ধ্বনিবিশ্লেষণ-করা শ্লোকাবলির মাধ্যমে একটি অপূর্ব অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

“দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ॥
স্মৃত্যুক্তিশ্রবণাদ্ যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতম্।
ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্তিতা॥
দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ।
দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা॥
বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।
তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্তিতা॥”[৩]

অর্থাৎ, ক) দ-কার দৈত্যনাশকে বোঝায়; খ) উ-কার অর্থে বিঘ্ননাশ; গ) রেফ ব্যবহৃত হয়েছে রোগনাশ বোঝাতে; ঘ) গ-ধ্বনি পাপনাশকে বোঝাচ্ছে; ঙ) আ-কার বোঝাচ্ছে ভয় এবং শত্রুনাশকে। পরে এটিকেই আর একটু সংহত করে বলা হল, এক) দুর্গ শব্দ দৈত্য বা বিপত্তিকে নির্দেশ করে; দুই) আ-কার সেই দৈত্য বা বিপত্তির নাশকে বোঝায়।

মহাভারতের বিরাটপর্বের অন্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের যে-দেবীস্তুতি পাই, সেখানেও দেবী দুর্গাকে এই তাৎপর্যেই বোঝানো হয়েছে। “দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।/ কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাং চ মহার্ণবে॥/ দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্॥/ জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ।/ যে স্মরন্তি মহাদেবীং ন চ সীদন্তি তে নরাঃ॥” ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ‘দুর্গোপাখ্যান’ নামক অংশে বলা হয়েছে, “দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।/ দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতম্॥”[৪]

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডী গ্রন্থে দুর্গা শব্দটিকে আমরা মোটামুটি আটবার খুঁজে পাই। এ-গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকটি এরকম : “মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।/ শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥” এই ‘দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা’ অংশের যে-ব্যাখ্যা টীকাকাররা

করেছেন, সেগুলির দিকে আমরা নজর দিতে চাই। প্রথমত, চতুর্ধরী টীকাকার বলছেন, "দুর্গো দুরবচ্ছেদো যো ভবসাগরঃ সংসারসাগরঃ তত্র নৌরিব নৌঃ পারগতিসাধনম্।" দ্বিতীয়ত, শান্তনবী টীকাকার লিখছেন, "হে দেবি ত্বম্ অসঙ্গা সংত্যক্তাখিলবন্ধনেষু অপ্রতিবন্ধা অনিবারিতগতিঃ দুর্গা দুষ্প্রাপা দুঃখেন গময়মানা দুর্গা দুর্গভবসাগরনৌরসি। দুর্গো দুস্তরঃ ভবঃ সংসারঃ সাগর ইব দুর্গভবসাগরঃ দুর্গভবসাগরে নোঃ দুর্গভবসাগরনৌ তরণিরসি।... যদ্বা দুর্গো দুস্তরো ভবঃ সংসারঃ তং দুর্গভবং স্যতি খণ্ডয়তি দুর্গভবসা। নো বিদ্যতে গরো বিষং দুঃখং যত্র সা অগরা অগরা চাসৌ নৌশ্চেতি অগরনৌঃ দুর্গভবসা চাসৌ অগরনৌশ্চেতি দুর্গভবসাগরনৌঃ। অথবা হে দেবি ত্বং দুর্গে দুর্গমে দুষ্প্রাপে ভবে শংভৌ পরব্রহ্মতত্ত্বসারে সামৃতে বিষয়ে অসঙ্গা রাগাদিরহিতা দুর্গা দুষ্প্রাপা দুর্লভা নৌস্তরণিরসি"। তৃতীয়ত, নাগোজীভট্টীতে বলা হচ্ছে, "মেধা সরস্বতী। সৈব দুঃখপ্রাপ্যত্বেন দুর্গাসীত্যুচ্যতে। দুর্গসংসারসাগরস্য নোঃ জ্ঞানদ্বারা।" চতুর্থত, দংশোদ্ধার টীকাকার লিখছেন, "দুর্গে দুর্গমে ভবসাগরে অসঙ্গা অপ্রতিহতপ্রসারা নৌঃ।"[৫]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য উপরের মন্তব্যগুলির মূল বক্তব্যকে সাজানোর আগে আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীর ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলিতে অন্যত্র 'দুর্গা' শব্দের যে-নামনিরুক্তিগুলি পাচ্ছি, সেগুলির একটু উল্লেখের প্রয়োজন আছে, পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে 'দুর্গা' শব্দটিকে দেখতে পাই। মূল শ্লোকটি এইরকম, "দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ। স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি॥/ দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা। সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥" এই শ্লোকের 'দুর্গা' শব্দের ব্যাখ্যায় চতুর্ধরী টীকা বলছেন, "দুর্গে সংকটে"। শান্তনবী টীকায় বলা হচ্ছে, "দুঃখেন গন্তুং শক্যতে অস্যাং দুর্গা 'সুদুরোধিকরণে চ' ইতি ডঃ।" আর নাগোজী ভট্ট বলছেন, "দুর্গে দুর্গমে সংকটে ইতি যাবৎ।"[৬] পঞ্চম অধ্যায়ে দুবার 'দুর্গা' শব্দটি পাই। দশ নম্বর শ্লোকে, "দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।/ খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥" এখানে চতুর্ধরী টীকাকার লিখছেন, "দুর্গায়ৈ দুরধিগম্যায়ৈ। গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাৎ দুর্গে সংকটে পারয়তি পালয়তীতি দুর্গা।" শান্তনবী টীকাকার লিখছেন, "দুঃখেন গম্যতে দুর্গা। যদ্বা দুঃখেন গচ্ছত্যস্যাং সা দুর্গা। ...দুর্গং পারং যস্যা মহামায়াখ্যসিন্ধোঃ সা দুর্গপারা।" নাগোজীভট্ট বলছেন, "দুর্গায়ৈ ইতি। দুঃখজ্ঞানায়ৈ। দুর্গো দুরধিগমঃ পরিচ্ছেদো যস্যাস্তস্যৈ।"[৭] ওই অধ্যায়েই ছেষট্টি নম্বর শ্লোকে আছে, "ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।/ দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও শান্তনবী টীকাকার লিখছেন, "দুর্গা দুর্গমা দুঃখপ্রাপ্যা।"[৮] নবম অধ্যায়ে ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে, "ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।/ চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্॥" এখানে দুর্গা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে চতুর্ধরী, নাগোজীভট্ট এবং দংশোদ্ধার—এই তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থেই 'সংকট' শব্দটিকে আনা হয়েছে। কেবল শান্তনবী তার পূর্বকৃত ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি করেছেন। দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শুম্ভ দেবীকে বলছেন, "বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।/ অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥" এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'দুর্গা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

শান্তনবী টীকাকার লিখছেন, “লোকাঃ দুঃখেন গচ্ছন্ত্যস্যাং সা দুর্গা।”[৯] একাদশ অধ্যায়ে তেইশ নম্বর শ্লোকে দেবীর স্তুতি করে বলা হচ্ছে, “সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।/ ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥”[১০] এই শ্লোকে উল্লিখিত ‘দুর্গা’ শব্দের পৃথক ব্যাখ্যা কোনও টীকাকারই করেননি। ওই একাদশ অধ্যায়েই পঁয়তাল্লিশ ও ছেচল্লিশ নম্বর শ্লোকদুটি প্রণিধানযোগ্য। সেখানে দেবী নিজমুখে বলছেন, “শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।/ তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।/ দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।/ পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা মহীতলে॥” এই শ্লোকে ‘দুর্গা’ শব্দের ব্যাখ্যায় শান্তনবী বললেন, “দুর্গাসুরমস্যতি সংহরিষ্যতি দুর্গাদেবী।”[১১]

উপরের প্রতিটি ব্যাখ্যার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে দেবী দুর্গার তত্ত্বকে শব্দানুসারী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাস্ত্রকাররা কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ ও ধারণাকে নিয়ে এসেছেন। ক) দুর্গাকে পাওয়া সহজ নয়, তিনি দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ; খ) এই সংসার দুর্গম, দুঃখপূর্ণ—তারই মধ্য থেকে তিনি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান; গ) ব্যক্তি বা সমষ্টির সংকটে তিনি আসেন ত্রাণকারিণি মূর্তি ধরে; গ) এই বিশ্বসংসার দুস্তর, সহজে একে পার হওয়া যায় না, কিন্তু তিনি এই দুর্গম সংসারবন্ধকে খণ্ডন করেন; ঘ) অজ্ঞানরূপ দুঃখপ্রাপ্তিকে তিনি জ্ঞানদ্বারা অতিক্রম করান। ঙ) দুর্গাসুরকে তিনি হত্যা করেছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শব্দকল্পদ্রুমকার দুর্গা শব্দের যে ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে এই ব্যাখ্যার সাদৃশ্য বহু ও নিকট। আসলে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি দুর্গার যে-আবির্ভাব কল্পনা করেছেন, ধ্যান করেছেন, সে-দুর্গা সংকটনাশিনী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোক বিরহদহন”—এই দুর্গম পথ পার হওয়া, এই বিরহদহনের মধ্য দিয়ে এগোনো মানেই যে দুর্গমতাকে বরণ করে নেওয়া; ভিতরের ও বাইরের দুর্গাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। বাইরের ও অন্তরের যে-অসুরবৃত্তিগুলি আমাদের নিয়ত গোচরে-অগোচরে যন্ত্রণা দেয়, আমাদেরকে নিত্য জন্ম-মৃত্যুর এই মহাচক্রের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়—সেই সমস্ত অসুরবধের প্রয়োজনেই দেবী দুর্গার আরাধনার আয়োজনকে অনুভব করেছেন আমাদের শাস্ত্র, আমাদের পূর্বাচার্য সাধকেরা। আজও সেই অনুভবের আয়োজন—গীতি বাজে শারদীয়ার পুণ্যবাসরে।

শ্রুতিসাহিত্যে দুর্গা—নাম ও রূপে

এবার আমরা প্রবেশ করি বৈদিক সাহিত্যের ভিতরে। কত প্রাচীনকাল থেকে এ-দেশ দুর্গার আরাধনায় মেতে উঠেছে, তা মনে রাখার মতো। হাজার হাজার বছরের সাধনায় ভারতের সাধক দেবী দুর্গার বেদিতলে বসেছে সিদ্ধি-মুক্তির অর্গল অপাবৃত করার প্রার্থনা নিয়ে। এ-ইতিহাস তাই কোনও খণ্ড-ক্ষুদ্র কালের সীমিত আখ্যানের মধ্যে বন্দি নয়। আজও যখন সাধক দেবীমণ্ডপের জাগপ্রদীপের আলোয় নিশা-শেষ ঊষায় মায়ের বৈতালিকী গেয়ে ওঠে, তখন ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাওয়া এক অলোক-আলোক-নন্দিত অতীতের থেকে ধীর-ললিত নিত্য-সুরের পঞ্চমেই যে তার সাধনকণ্ঠ এসে মিলে যায়, ধন্য হয়।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা ‘দুর্গা’ শব্দ ও দুর্গার তত্ত্ব দুটিই পেয়েছি। অবশ্য অনেক সময় দুর্গাতত্ত্ব আলোচনায় সমপর্যায়ভুক্ত অন্য নাম পাওয়া গেছে।

দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত নামে যে-দুটি প্রাচীন বৈদিক সূক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থপাঠ ও পুরশ্চরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সে-দুটিই ঋগ্বেদসংহিতায় উল্লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচণ্ডীর গুপ্তবতী টীকায় আমরা দুটি সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাই। প্রথমে টীকাকার সপ্তশতী পাঠের বিধি বলতে গিয়ে মরীচিকল্পের একটি স্তোত্র উল্লেখ করে লিখছেন, "মরীচিকল্পে—রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে চণ্ডীস্তোত্রং পঠেৎ।/ প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তং ইতি ক্রমঃ॥/ এবং সংপুটিতং স্তোত্রং পূর্বোক্তফলদায়কম্॥ ইত্যনেন বৈদিকসূক্ত-দ্বয়েন সংপুটিতায়াঃ সপ্তশত্যা বিধানাচ্চ।"[১২] ওই একই ভাষ্যে আরও একবার দুর্গাসপ্তশতীর পুরশ্চরণ প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনার সময় মরীচিকল্পের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন লেখক, "রাত্রিসূক্তং প্রতিঋচং তথা দেব্যাশ্চ সূক্তকম্।"[১৩] বৈদিক ও তন্ত্রশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত মূল ঋক এবং দুর্গাসম্বন্ধীয় বলেই মরীচিকল্প এমন ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন এবং গুপ্তবতী টীকাও সেটির সমর্থনসূচক উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[১৪] দেবীসূক্তে যে-দেবীর উক্তি বিধৃত আছে, আচার্য সায়ন তাঁকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি হলেন, 'সর্বস্য জগৎ ঈশ্বরী', 'তথা দ্যাব্যাপৃথিবী দিবং চ পৃথিবীং চ অন্তর্যামিতয়া অহম্ এব আ বিবেশ প্রবিষ্টবতী'। এই দেবী কী কাজ করেন আমাদের জন্য? দেবীর উক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়ন বলছেন, 'ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং শরবে শরুং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনমসুরং হন্তবৈ হন্তুং হিংসিতুম্।'[১৫] বস্তুত সম্পূর্ণ দেবীসূক্তের সুধীর পাঠের মাধ্যমে যেকোনও পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এই দেবীই আমাদের পৌরাণিক দুর্গা—যিনি জগজ্জননী, অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করে আছেন সকলের মধ্যে, আবার যিনি অসুরবিনাশের জন্যই বারেবারে আবির্ভূতা হন। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থেও দেবীর এই অসুরবিনাশী আশ্বাস আমরা পেয়েছি।[১৬] ঋগ্বেদের বিভিন্ন দিক, বিশেষত সেখানে উল্লিখিত দেবতাদের সম্পর্কিত একটি অতি প্রামাণিক বই হল 'বৃহদ্দেবতা'। এই গ্রন্থে ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতা রূপে দুর্গার উল্লেখ রয়েছে এইভাবে, 'এষৈব দুর্গা ভূত্বর্চ কৃত্বা স্যাত্সূক্তভাগিনী।'[১৭] তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গার উল্লেখ রয়েছে আরও বিস্তৃত আকারে। 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং' ইত্যাদি সূক্তের ভাষ্যে আচার্য সায়ন লিখছেন, "যেয়ং নবদুর্গা কল্পাদিষু মন্ত্রশাস্ত্রাদিষু প্রসিদ্ধা তাং দুর্গাং দেবীং অহং শরণং প্রপদ্যে।"[১৮] ভাষ্যকার সায়ন এখানে বৈদিক দেবী দুর্গাকেই মন্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র-পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত দেবী দুর্গা বলে নির্দেশ করেছেন। বস্তুত 'দুর্গাসূক্ত' বলে সমধিক পরিচিত এই বৈদিক সূক্তখানি সর্বাঙ্গেই দেবী দুর্গার তত্ত্ব ও মহিমাকে খ্যাপন করেছে। সামবেদীয় তলবকার উপনিষৎ বা কেন উপনিষৎ গ্রন্থেও আমরা দুর্গার উল্লেখ দেখতে পাই 'উমা' নামে। উপনিষদের সুপরিচিত আখ্যায়িকাটির শেষে কেন শ্রুতি বলছেন, "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়ময়াজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।" এর ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর লিখছেন, "তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধ্বা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভবৎ স্ত্রীরূপা।... অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত্বা তামুপজগাম।"[১৯] অর্থাৎ শঙ্করাচার্য দুভাবে 'উমা'র আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমত উমারূপী তত্ত্ববিদ্যা, দ্বিতীয়ত হিমালয়ের দুহিতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্তা উমা। পরবর্তী কালের আরাধ্যা দেবী দুর্গার সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচয়টি

যে একেবারেই সদৃশ, সেটি সহজবোধ্য।

দেবী দুর্গার অস্তিত্ব ও প্রকাশ তাই একালের নয়। সুপ্রাচীন বৈদিক কাল থেকেই আমাদের জীবনের নানা স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি। একালের সাহিত্যতত্ত্ব স্বীকার করে যে, সাহিত্য কেবল কল্পলোকের নয়—সে ফুল ফোটাতে পারে আকাশের তারায় তারায়, কিন্তু তার কোনও না কোনও শিকড় থাকে জীবন-মাটির গভীর দেশে। ব্যক্তি-মানুষ ও সমষ্টি-মানুষ অনাদি কাল থেকেই সাহিত্যের পরিসরে গোচরে-অগোচরে স্থান পেতে নিয়েছে—স্রষ্টা চান বা না চান। শিল্পী-সাহিত্যিকের অন্তর্লোকে এই প্রভাব পড়ে থাকে তাঁদের অজান্তেই। যখন তাঁরা তুলি-কলম নিয়ে বসেন, তখন অনেক আগে বা অতি নিকট কালের দেখা-শোনা-জানা নানা বিষয় একরকম যেন বাধ্য করে তাঁদের প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই জানা-শোনা-দেখা জিনিসকেই ফুটিয়ে তুলতে। শিল্পীর জীবনে তাই কল্পনার ডানা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, পর্যবেক্ষণের পা-দুখানিও সমান প্রয়োজনীয়। অপরদিকে তাই, পাঠক যখন কোনও সাহিত্যের রসোদ্ধারে ব্রতী হন, তখন তাঁকেও খেয়াল রাখতে হয়, সাহিত্যের রসাস্বাদের পঞ্চমে সুর বাঁধতে বাঁধতে তিনি যেন সেই সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা মহাকালের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানগুলি চিহ্নিত করতে ভুলে না যান। আসলে সময় ও সমাজের জীবন্ত ছবিগুলিই যে সৃষ্টিকে অনাদ্যন্ত সৃষ্টির নন্দিত রাজপথে প্রতিষ্ঠা দেয়। আর পাঠককুল ও উত্তরকাল তার মধ্য থেকে খুঁজে পায় প্রত্ন-ইতিহাসের অমূল্য আকর। অনন্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উৎস হিসেবে দেখা ছাড়াও, এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের বৈদিক-পৌরাণিক-আগম শাস্ত্রসমূহকে পাঠ করা যেতে পারে। একালের কোনও কোনও অতি-প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিজীবীর প্রবণতা দেখা যায়, তাঁরা আমাদের বেদ-পুরাণকে কেবল গল্পগাছা বলে উড়িয়ে দিতে চান। এ এক অনমনীয় কুসংস্কার। যাই হোক, এটুকুই কেবল বক্তব্য যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলি সেকালের বহমান সময় ও সমাজের অগণন ছবিকে ধরে রেখেছে সৃষ্টির ক্যানভাসে। মুক্তমনা সচেতন পাঠক সেই বিপুল আখ্যানকে খুঁজে পাবেনই শ্রম ও নিষ্ঠার পথ ধরে। সেই পথেই দেবী দুর্গা কেবল একালের নয় বলে বোঝা যায়। আমাদের অনবদ্য এই অধ্যাত্মমণ্ডিত সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই তিনি উপস্থিত—তার প্রকাশ স্পষ্ট আমাদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে।

পুরাণ-স্মৃতি-তন্ত্রে দুর্গা আখ্যান

উত্তর-বৈদিক কালে পুরাণে, স্মৃতিসাহিত্যে ও তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী দুর্গার প্রচুর আখ্যান, মন্ত্র, পূজার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সে-আলোচনা বা চর্চার কাল আজও সমভাবে প্রবহমান। স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুর বধের কাহিনিটি এইভাবে ধরা আছে—খুব তপস্যা করার ফলে ব্রহ্মা দুর্গাসুরকে তার বাঞ্ছিত বর দিলেন যে, ত্রিলোকে কোনও পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। এর ফলে দুর্গাসুর প্রচণ্ড হয়ে উঠল এবং তার কাছে পরাজিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোক ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন, যার ফল মর্তেও ভীষণভাবে দেখা দিল; যজ্ঞক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল, বেদপাঠ বন্ধ হল। চারিদিকে এত অস্থিরতা, অরাজকতা দেখে দেবতারা শিবের কাছে গেলেন এবং সব জানালেন। শিব তখন মহেশ্বরী ভবানীকে বললেন দুর্গাসুরকে দমন করতে যাতে কিনা সর্বত্র এই দুর্দিন দূর হয়। ভবানীর আদেশে রুদ্রাণী কালরাত্রি এক অপরূপা

সুন্দরী নারীমূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে দুর্গাসুরকে বললেন যে তিনি যেন স্বর্গ ছেড়ে রসাতলে চলে যান। ইনিই মহাকালী। যাই হোক দুর্গাসুর শুনলেন না, বরং আদেশ দিলেন যে ওই নারীকে যেন বন্দি করে আনা হয়। এর ফলে শুরু হল যুদ্ধ। কালরাত্রি খবর পাঠালেন বিন্ধ্যবাসিনীকে। মহাদেবী তখন হাজার হাতে হাজারটি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে দুর্গাসুরের সমস্ত সৈন্য বধ করলেন। দুর্গাসুর কখনও মত্ত হাতির রূপে, কখনও মহিষ রূপে, কখনও সহস্রবাহু যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে দেবীর দ্বারা নিহত হলেন। দেবতারা শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পেলেন এবং মহাদেবীর স্তব করতে লাগলেন। দেবী তাঁদের স্তবে খুশি হয়ে বললেন, "অদ্যপ্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।/ দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥ যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ।/ দুর্গাস্তুতিরিয়ং পুণ্যা বজ্রপঞ্জরসংজ্ঞিকা॥"[২০]

তবে অনেক পণ্ডিতই মনে করেছেন যে, দেবীভাগবত পুরাণের কাহিনিটি 'অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় এবং তা দুর্গতি-নাশের একটি ক্রমিক পর্যায় হিসেবে এসেছে বলে অসুর বধের চাইতেও এখানে দুর্গার দুর্গতিনাশিনী ভূমিকা বড়ো হয়ে' উঠেছে।[২১] এর কাহিনিটি এইরকম—রুরুর ছেলে দুর্গ অনুধাবন করেছিল যে ঋষিরা বেদবিধি অনুসরণ করে যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞে যে-হবি আহুতি দেন, সেটি গ্রহণ করে দেবতারা শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। অতএব তার মনে হল, বেদের অধিকার যদি সে লাভ করে তাহলে এই সমস্ত মন্ত্রও তার কাছে চলে আসবে। ফলত যজ্ঞ বন্ধ হবে, দেবতারা হীনশক্তি হয়ে পড়বেন। এই ভেবে সে

ব্রহ্মার তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করল এবং বর চাইল, "ত্রিষু লোকেষু যে মন্ত্রা ব্রাহ্মণেষু সুরেষ্বপি।/ বিদ্যন্তে তে তু সান্নিধ্যং মম সন্তু মহেশ্বর।/ বলঞ্চ দেহি যেন স্যাদ্দেবানাঞ্চ পরাজয়ঃ॥" ব্রহ্মা তাকে সেইরকমই বর দিলেন। ফলত যজ্ঞ বন্ধ হল। দেবতারা শক্তিশূন্য হয়ে পড়লেন। দুর্গ সহজেই দেবপুরী দখল করে নিল। এদিকে মর্তেও আর এক দুর্যোগ দেখা দিল। যজ্ঞ বন্ধ হওয়ায় অগ্নিতে আর আহুতিরূপে ঘি পড়ছিল না। যার ফলে বৃষ্টির অভাব দেখা দিল। একশো বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলল। প্রচুর মানুষ এবং গো-মহিষের মৃত্যু হল। তখন শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণেরা হিমালয়ে গিয়ে মা ভবানীর আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁদের আরাধনা ও স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে ভুবনেশ্বরী পার্বতী এক অদ্ভুত রূপে দেখা দিলেন। নীলপদ্মের মতো অনন্ত নয়নসম্পন্না তিনি। দেহকান্তি সুনীল। চতুর্ভুজা। ডান দিকের নিচের হাতে মুঠো করে ধরা আছে অনেকগুলি বাণ। ডান দিকের উপরের হাতে পদ্ম। বাম দিকের উপরের হাতে ধরা ফল-ফুল-শাক-মূল ইত্যাদি। নিচের বাঁ হাতে ধনু। ব্রাহ্মণদের কাতর প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠায় করুণা-পরবশ তাঁর সেই নয়নমণ্ডলী দিয়ে অজস্র ধারায় জল বর্ষিত হতে লাগল। নয় দিন এমন ক্রমাগত ধারাপাতের ফলে পৃথিবীর সমস্ত জলাভাব দূর হয়ে গেল। তৃপ্ত দেব-মানব সকলে তখন দেবীকে আবারও বন্দনা করতে লাগলেন এবং বললেন, যেহেতু তিনি শত শত অক্ষির জলধারায় এই বসুন্ধরাকে বাঁচিয়েছেন, তাই তাঁর এই রূপের নাম হবে শতাক্ষী। আবার যেহেতু দেবী নিজে শাক প্রভৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ক্ষুধায় কাতর জগতকে সেগুলির দ্বারা রক্ষা করেছিলেন, তাই তাঁর আর এক নাম হল শাকম্ভরী। এরপর শুরু হল মহাসমর। এগারো দিন ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করার পর সেই অসুর নিহত হল দেবীর কাছে।[২২]

শ্রীশ্রীদুর্গার সহস্রনামের উল্লেখ আছে একাধিক পুরাণ ও তন্ত্রে। স্কন্দপুরাণ ও কূর্মপুরাণে যেমন এই উল্লেখ পাই, তেমনি তন্ত্ররাজতন্ত্র ও কুলার্ণবতন্ত্রেও এর উল্লেখ আছে। সব কটি নাম একই নয়, মিলও যেমন আছে, কিছু নতুন নামও আছে। যে-দুর্গাপূজা নিয়ে আমাদের এমন মাতোয়ারা মনোগতি, সেই দুর্গা আমাদের কাছে মহিষমর্দিনী রূপে আবির্ভূতা। উমা, পার্বতী ইত্যাদি কয়েকটি নামও এক্ষেত্রে প্রচলিত। মহিষমর্দিনী রূপের বর্ণনা কালিকাপুরাণে খুব বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এর বর্ণনা আছে বামনপুরাণে, দেবীভাগবতে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে।[২৩] এইসব গ্রন্থের ও সমস্তরীয় অন্যান্য আরও কিছু আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায়, মহিষাসুর তিনকল্পে তিনবার রম্ভাসুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনবার দেবী দুর্গার তিনটি রূপের দ্বারা নিহত হন। প্রথমবার অষ্টাদশভুজা দেবী উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয়বার ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে এবং তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে দেবীর হাতে নিহত হন মহিষাসুর। কালিকাপুরাণ এবং বামনপুরাণ উভয়েই জানিয়েছেন, এই তৃতীয়বার দেবী আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে হিমালয়ে কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে দেবতাদের মিলিত তেজ থেকে দশভুজা মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হন। সেই তেজে কাত্যায়ন মুনির তেজও মিলিত হয়েছিল। দেবীও স্বয়ং কাত্যায়নের কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর আর এক নাম কাত্যায়নী। আজকের দুর্গাপূজা এই দেবীর আরাধনা। দেবীভাগবত জানিয়েছেন, দশভুজা দেবী দুর্গা শুক্লাষ্টমীতে মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিধন করেন।

দেবতারা তাই নবমীতে দেবীর পূজা করেন আর দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জন দেন। কালিকাপুরাণ অবশ্য নবমীতে দেবীর দ্বারা মহিষাসুরের নিহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কালিকাপুরাণের বচনকে কোনও কোনও পণ্ডিত লিপিকরকৃত ভুল বলে মনে করেন।[২৪] এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা এবং ষোড়শভুজা ভদ্রকালীও এই একই সময়ে অর্থাৎ আশ্বিনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তবে কালিকাপুরাণ বলছেন, দেবী আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে উগ্রচণ্ডারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার মহিষাসুরের দ্বিতীয় জন্মের কালে দেবী ওই আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতেই নিজের সতীরূপ পরিত্যাগ করে 'ভদ্রকালী' রূপ ধরে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি কোটি যোগিনীর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ওই কারণেই দেবীর মূল মন্ত্রে 'দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ', 'যোগিনিকোটিপরিবৃতায়ৈ' এবং 'ভদ্রকাল্যৈ' এই তিনটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।[২৫] প্রথমবার মহিষাসুর বধের জন্য তিনি উগ্রচণ্ডার রূপ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম 'মহাঘোরা'। এই বিশেষণটিও ব্যবহৃত হয়েছে দেবীর স্বরূপ নির্ধারণের জন্য দেবীপূজার মূল মন্ত্রে। অবশ্য দেবীপুরাণে যে-ঘোরাসুরের কাহিনি আছে সেখানে বলা হয়েছে, দেবী আশ্বিন মাসে বিন্ধ্যাচলে আবির্ভূতা হয়ে মহানবমীতে ঘোরাসুরকে নিধন করেন। এই সময়েও দেবী দশভুজারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কারণেও দেবীর মূলমন্ত্রে তাঁকে 'মহাঘোরা' বিশেষণ দ্বারা অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত রঘুনন্দন ও পরবর্তী পণ্ডিতেরা দেবীপুরাণে এই সূত্রেই বিবৃত দেবী দুর্গার যে-পূজাবিধান আছে, তাকে গ্রহণ করেছেন। সেই অনুযায়ী এই পর্বে দেবীর আবির্ভাব আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতে এবং ঘোরাসুর নিধন নবমীতে; তাই এখানে উল্লিখিত দেবীপূজা ষষ্ঠ্যাদিকল্পের পূজা।[২৬]

বস্তুত শাস্ত্রবিদরা দেখিয়েছেন যে, দেবীর নিত্যবাসস্থান কৈলাস। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যুগে দানব সংহারের জন্য তিনি কখনও আবির্ভূত হয়েছেন বিন্ধ্যাচলে, কখনও বা হিমালয়ে। দুর্গাপূজার আবাহন মন্ত্রে এই কারণেই বলা হয়, হে দেবি, তুমি কৈলাসে যে-মূর্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিতা, বিন্ধ্যাচলে ঘোরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের কালে এবং পরবর্তীতে মহিষাসুরকে হত্যার জন্য কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে যে-দশভুজা মূর্তিতে তুমি আবির্ভূতা হয়েছ, সেই দশভুজা দুর্গারূপেই তুমি বিল্বশাখায় এবং মৃন্ময়ী বিগ্রহে আবির্ভূতা হও। এগুলি সবই সত্যযুগে ঘটেছিল। ত্রেতাযুগে রাবণ নিধনের জন্য শ্রীরামের পূজায় সন্তুষ্টা দেবী আবারও আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই কাহিনি মহাভাগবতে, কালিকাপুরাণে ও দেবীভাগবতে বর্ণিত আছে। মহাভাগবত অনুসারে রামচন্দ্র ব্রহ্মাকে বরণ করেন এই পূজার জন্য। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করে শুক্লা ষষ্ঠীতে আমন্ত্রণক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং যথাবিহিত পূজাদি করে দশমীতে দেবীবিসর্জন নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু কালিকাপুরাণের মতে ব্রহ্মা আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূজা আরম্ভ করেছিলেন। নবমীতে রাবণ নিহত হয়। দশমীতে হয় তাই বিজয়োৎসব। তবে কালিকাপুরাণের আর এক জায়গায় ব্রহ্মা যে কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করেছিলেন এমন উল্লেখ আছে। দেবীভাগবতে বলা হচ্ছে যে কিষ্কিন্ধ্যায় থাকার সময়েই রাম নবরাত্রব্রত পালন করে দেবী দুর্গার পূজা করেন এবং তারপর সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। তবে এই সমস্ত বিবরণেই শরৎকালে দুর্গাপূজার উল্লেখ স্পষ্ট। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী গ্রন্থে সমাধি বৈশ্য ও সুরথ রাজার

দ্বারা যে-মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে তা শরৎকালেও হয়ে থাকতে পারে আবার বসন্তকালেও হয়ে থাকতে পারে, অথবা হয়তো উভয়কালেই হয়েছিল এমন হতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যেমন শরৎকালের উল্লেখ করেছেন, বাচস্পতি মিশ্র আবার তাঁর কৃত্যচিন্তামণি গ্রন্থে বসন্তকালের উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতদের মতে, রামচন্দ্র বোধহয় বসন্তকালেই দুর্গাপূজা করেছিলেন; তাঁর হয়ে প্রথম পূজাটি ব্রহ্মা করেছিলেন শরৎকালে।[২৭]

অনির্বাণ জাগপ্রদীপের আলো

দুর্গাতত্ত্ব-দুর্গাআখ্যান-দুর্গাপূজাবিধি-র পরিধি বিরাট। জগজ্জননী যেমন বিশ্বময়ী, তাঁর গল্প-স্বরূপ-আরাধনাপদ্ধতিও তেমনি কূলহারা। কত কথা যে বলা হল না, কত শাস্ত্র যে বাইরে থেকে গেল তার হিসাব নেই। বাকি রইল আর এক বিরাট ক্ষেত্র—তাঁর পূজামন্ত্র, পূজাবিধি। সে-সম্বন্ধেও বহু শাস্ত্র, বহু আলোচনা হয়ে গেছে কতকাল ধরে, কত প্রাজ্ঞজনের বিদ্যাচর্চা-অঙ্গনে। মায়ের কৃপা হলে ভাবী কালে আবারও চেষ্টা করা যাবে সেই সমুদ্রে অবগাহন-স্নানের পাবন-আয়োজনের। দেবীপক্ষের সূচনায় যখন মাতৃস্তবের সপ্তসুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে, বোধন-অধিবাসের মাঙ্গলিক মুহূর্তে যখন প্রকাশিত হয় অনির্বাণ জাগপ্রদীপের আলো, দশমীর সন্ধ্যায় যখন পবিত্র ভাগীরথীর জলে ভেসে যায় মায়ের নিত্যোৎসবের সপ্তডিঙা মধুকর—সেইসব ধন্য-পুণ্য লগ্নে আমরা শুধু কৃতাঞ্জলি বসে থাকি মায়ের চিরপ্রসন্ন হাসিমাখা আশিসের শান্ত-কোমল ছোঁয়াটুকু লাভের আশায়; সেখানেই যে আমাদের প্রাপ্তির পূর্ণতা, মুক্তির তীর্থতীর।

ইতিহাস যে-অতীতের তল খুঁজে পায়নি, পাণ্ডিত্য যে-মহাকালের দুয়ারে প্রবেশ করতে অপারগ, ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাওয়া সেই একান্ত আপন-গোপন ফেলে-আসা সময়ের আলো-আঁধারির বীথিপথ দিয়ে মা দুর্গা যেন চলেছেন আমাদের সভ্যতার পলাশে জ্বলা মশালের আলোক সঙ্গে নিয়ে। সময় বদলেছে। পরিবেশ পালটে গেছে। মানুষের জীবনযাপনের সুরগুলি নতুন পঞ্চমে ধ্বনিত হয়েছে। তবু মায়ের আগমনী-বিজয়ার শারদ-প্রভাত তো কখনও মলিন হয়নি এদেশে। বৈদিক-পৌরাণিক-তান্ত্রিক—মহাকালের সব অধ্যায়েই মায়ের দুর্গতিনাশিনী রূপটি আমাদের শক্তি জোগায়, দুর্যোগের আঁধার রাতে পথ পার হতে আলো দেখায়। আমাদের দেশের জীবনভাবনার প্রতিটি স্তরে জগত-জননীর ছোঁয়া আজ ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। সেদিক থেকে মা দুর্গা যেন সনাতন হিন্দু সভ্যতার এক উজ্জ্বলতম অভিজ্ঞান—মহাজাগতিক আলোর অনির্বাণ রশ্মিপ্রপাত।✠

তথ্যসূত্র

১। রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর, *শব্দকল্পদ্রুমঃ*, দ্বিতীয় কাণ্ড, নাগ প্রকাশন, নিউ দিল্লি, ২০১৮, পৃঃ ৭২৭

২। তদেব, পৃঃ ৭২৮

৩। তদেব, পৃঃ ৭২৮

৪। সম্পাদক শ্রীরাম শর্মা আচার্য, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, সংস্কৃতি সংস্থান, বেরিলি, উত্তরপ্রদেশ, ১৯৭০, পৃঃ ৩৯১

৫। Editor: Dr N. C. Panda, *Durga-saptasati*, Sanskrit Text with Seven Commentaries and Revised English

Translation, Vol. 1, *Bharatiya Kala Prakashan*, Delhi: 2012, p. 302-303 [Hereafter, *Durgasaptasati*]

৬। তদেব, p. 309-310

৭। *Durgasaptasati*, pp. 352-353

৮। তদেব, p. 395

৯। তদেব, p. 549-550

১০। তদেব, p. 605

১১। তদেব, p. 622-623

১২। *Durgasaptasati*, p. 18

১৩। Ibid, p. 21

১৪। সম্পাদনা: সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, *দুর্গাপূজাতত্ত্ব*, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, প্রকাশক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ভূমিকা, পৃঃ ৩০

১৫। Editors: N. S. Sontakke and C. G. Kashikar, *Rigveda Samhita with the Commentary of Sayanacarya*, Vaidik Sanshodhanamandala: Pune, 1946, p. 766-768

১৬। *Durgasaptasati*, p. 625-626

১৭। Editor: Arthur Anthony Macdonnel, *The Brihddevata, Saunaka*, Part 1, Harvard University, 1904, p. 18 & 171

১৮। *তৈত্তিরীয় আরণ্যকম্*, সায়নাচার্যবিরচিতভাষ্য-সহিতম্, রাজেন্দ্রলালমিত্রেণ পরিশোধিতম্, কলিকাতা, ব্যাপটিষ্ট মিশন, ১৮৭১, পৃঃ ৭৮৭-৭৯১

১৯। সম্পাদক: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, *ঈশ, কেন, কঠ উপনিষদ*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ৬৩-৬৪

২০। সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, *স্কন্দ-পুরাণম্*, বেদব্যাসবিরচিতম্, খণ্ড ৪, কাশীখণ্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭, অধ্যায় ৭১-৭২, পৃঃ ২৫৩৬-২৫৪৯

২১। সম্পাদক: নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *পুরাণকোষ*, খণ্ড ৩, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০২২, পৃঃ ২৩৭

২২। সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, ব্যাসদেব, *দেবীভাগবতম্*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ৬৮৬-৬৯০

২৩। কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ, দেবীভাগবত ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে এর কাহিনি বিস্তৃত আকারে আছে। বস্তুত, মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী দুর্গাপূজার সময় নিত্যপঠিত হয়। আরও কয়েকটি গ্রন্থে এই সম্পর্কে পুরাণানুগত আলোচনা বিস্তৃত আকারে করা আছে : ক) পুরাণকোষ, সম্পাদক : নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, খ) বাংলা বিশ্বকোষ, সম্পাদক: নগেন্দ্রনাথ বসু, গ) সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত শ্রীরঘুনন্দনকৃত 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে'র ভূমিকা।

২৪। দ্রঃ তথ্যসূত্র ১৪, পৃঃ ১৬-১৭

২৫। সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিত *কালিকাপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪, ৬১ অধ্যায়, শ্লোক ২ এবং ৬-৭, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৫

২৬। দ্রঃ তথ্যসূত্র ১৪, পৃঃ ১৮

২৭। উপরের আলোচনাটির ক্ষেত্রে আমরা মুখ্যত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত শ্রীরঘুনন্দনকৃত 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে'র ভূমিকার উপর নির্ভর করেছি। তবে উল্লিখিত মহাভাগবত, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও রঘুনন্দনকৃত মূল 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' গ্রন্থসমূহও এক্ষেত্রে পাঠ করে দেখা গেছে যে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের বক্তব্য একেবারেই যথার্থ।